بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ১৯ ফাতাহ্, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (সূরা আল-আহযাব: ২২)

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই আয়াতের অনুবাদ হলো: "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকাল বা শেষ দিনের (সাক্ষাতের) আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক হারে স্মরণ করে।"

হযরত আয়েশা (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, মহানবী (সা.)-এর সুমহান চরিত্র এবং তাঁর পবিত্র আদর্শ সম্পর্কে কিছু বলুন। হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দেন, তুমি কি কুরআন মজীদ পড়ো নি? তাতে তো আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁর (সা.) আদর্শ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (সূরা আল-কলম: ৫)

অর্থাৎ "হে রসূল! নিশ্চয়ই তুমি নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চ মানে অধিষ্ঠিত।"

বস্তুত আদর্শ বা নমুনা তো তারাই হয়ে থাকে যারা কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে। মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে তা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য আদায়ের বিষয় হোক বা আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকার আদায় হোক–উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সেই সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন যার সাক্ষ্য আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং দিয়েছেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলেছেন যে, এই রসূল তোমাদের জন্য আদর্শ। তাঁর কথা কেবল শুনবেই না, বরং সেগুলোর ওপর আমলও করবে। অর্থাৎ কেবল ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়, সে অনুসারে কাজ করলে তোমরা অবশ্যই সেই মর্যাদাও লাভ করতে পারবে যার জন্য আমি এই রসূলকে পাঠিয়েছি। তাই এটি প্রত্যেক মুসলমান তথা মু'মিনের দায়িত্ব।

পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যারা সামান্য কিছু ভালো কাজ করে বা কথা বলে যা প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাদের নামের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার দেওয়া হয়। কেউ নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে, কেউ অন্য কিছু। কিন্তু এই পুরস্কার কোনো কমিটি বা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় যা সেই কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। তবে এমনটি কখনো হয় নি যে, পুরো জাতি কোনো একটি বিষয়ে একমত হয়ে কোনো স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রকৃত পুরস্কার তো সেটি যা মহানবী (সা.)-কে যৌবনে নবুওয়তের পূর্বে তাঁর জাতির লোকেরা 'সাদিক' (সত্যবাদী) এবং 'আমীন' (আমানতদার) উপাধি প্রদানের মাধ্যমে দিয়েছিল। তাঁর কোনো পার্থিব পুরস্কারের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে তিনি এমন এক সুউচ্চ মর্যাদায় উপনীত ছিলেন যার কোনো তুলনা নেই, এবং পুরো জাতি তাঁকে সেই উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

অতএব এটিই সেই সুউচ্চ মর্যাদা যা কেবল মহানবী (সা.)-এর রয়েছে। মহানবী (সা.) নিজেও বলেছেন, তোমরা আমার সুন্নতের অনুসরণ করো এবং আমার কর্ম অনুযায়ী

চলো, কারণ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সংশোধনের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। মহানবী (সা.) আরো বলেন, **উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে।** সুতরাং চরিত্রের পূর্ণতা কেবল তিনিই দান করতে পারেন যিনি নিজে এই সকল গুণাবলির আধার হয়ে থাকেন এবং যাঁর সত্তায় সকল সদ্‌গুণ বিদ্যমান থাকেন।

যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেছেন যে, তিনি (সা.) আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাই আমাদের উচিত তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শকে আমাদের জন্য সেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যেন আমরা তাঁর প্রতিটি নির্দেশের ওপর আমল করতে পারি। আর তাঁর প্রতিটি কথা কুরআন করীমের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং চারিত্রিক গুণ যা কোনো মানুষের মধ্যে থাকতে পারে বা থাকা উচিত, অথবা আল্লাহ্ তা'লার যে-সকল ঐশী গুণ রয়েছে, মহানবী (সা.) হলেন সেগুলোর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-ও 'দীবাচা তাফসীরুল কুরআন'-এ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন এবং আমাদের সীরাতগ্রন্থগুলোতেও তাঁর চরিত্র ও সীরাত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। আজ আমি সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করছি; ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করব।

প্রথম বিষয়টি হলো আল্লাহ্ তা'লার হক অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের হক। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর মাঝে আমরা কেমন আদর্শ দেখতে পাই? আমরা দেখি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সারাটি জীবন খোদাপ্রেমে কেটেছে। তাঁর ওপর অনেক বড়ো বড়ো দায়িত্ব ছিল– নতুন শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের তরবিয়ত করা, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন– তিনি (সা.) অসভ্যদের মানুষ বানিয়েছেন, সুশিক্ষিত মানুষ বানিয়েছেন এবং তাদের আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষে পরিণত করেছেন; এটি অনেক বড়ো কাজ ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র যে হক অর্থাৎ ইবাদতের দায়িত্ব ছিল– তা কখনো বিস্মৃত হন নি। এটি খুবই বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁকে (সা.) অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানেও যেতে হয়েছে, শত্রুরা আক্রমণও করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালনে তিনি কখনোই সামান্যতম বিচ্যুতি বা ত্রুটি করেন নি।

অতএব এই হলো সেই আদর্শ যা আমাদের সামনে বিদ্যমান যে, আমরা যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লাকে আমাদের সামনে রাখি। আর আল্লাহ্ তা'লাকে আমাদের সামনে রাখলে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা আপনাআপনিই সমাধা হতে থাকবে। মানুষ বলে, আমাদের এই সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যা রয়েছে; আমরা অমুক ভাবে দোয়া করেছি, তমুক ভাবে দোয়া করেছি। তারা নিজেদের সমস্যার জন্য দোয়া করে। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায় করি না, যার ফলে মানুষ বঞ্চিত থেকে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার প্রাপ্য প্রদান করো।

তাঁর (সা.) ইবাদতের মান কেমন ছিল? মহানবী (সা.) কিছুটা রাত বা অর্ধেক রাত অতিবাহিত হতেই আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাও এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার এমন এক সময়ে যখন তিনি ইবাদতের জন্য দাঁড়াচ্ছিলেন, তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে তো আপনি আগে থেকেই অত্যন্ত প্রিয় ও নৈকট্যভাজন, তবুও কেন আপনি নিজেকে এত কষ্টের মুখে ঠেলে দেন? রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটিয়ে দেন এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা!

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (অর্থাৎ আমি কি এক কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?)। এটি সত্য কথা যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাকে এই নৈকট্য দান করেছেন; কিন্তু এটি কি আমার কর্তব্য নয় যে, সাধ্যমতো তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কারণ কৃতজ্ঞতা তো অনুগ্রহের বিনিময়েই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা হলো, তিনি তাঁকে সর্বশেষ শরীয়তবাহী নবী বানিয়েছেন, তাঁর ওপর সর্বশেষ কিতাব পূর্ণ করেছেন এবং শরীয়তকে পূর্ণতা দান করেছেন– এসবের কারণে তিনি এই কথা বলেছেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব না? অথচ নিজ নিজ অবস্থানে প্রত্যেক মানুষের ওপরই আল্লাহ্ তা'লা প্রভূত অনুগ্রহ করে রেখেছেন। এই কৃতজ্ঞতার দাবি হলো, আমরা যেন নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করি। মানুষজন প্রশ্ন করে থাকে, যুবকরাও আসে এবং জিজ্ঞেস করে, আমরা কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করব? আমাদের ইবাদতের আল্লাহ্ তা'লার কী প্রয়োজন? বর্তমান বস্তুবাদিতায় প্রভাবিত হয়ে শিশুরাও এসব প্রশ্ন করছে। এর উত্তর হলো, আল্লাহ্ তা'লার তোমাদের ইবাদতের প্রয়োজন নেই; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর যেসব অনুগ্রহ করেছেন– তা কি এই দাবি করে না যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হও?

একইভাবে তাঁর (সা.) জীবনচরিতে এই ঘটনাও পাওয়া যায় যে, যখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার কালাম (কুরআন) শুনতেন, তখন অবলীলায় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো; বিশেষ করে সেই আয়াতগুলো শুনলে যেখানে তাঁর দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-কে বলেন, আমাকে কুরআন শরীফ পড়ে শোনাও। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কুরআন করীম তো আপনার প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আপনাকে কী শোনাবো? তিনি বলেন, আমি অন্যদের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন, তখন আমি সূরা আন-নিসা পাঠ করে শোনাতে আরম্ভ করলাম। যখন আমি পড়তে পড়তে নিম্নের আয়াতে পৌঁছলাম:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (সূরা আন-নিসা: ৪২)

অর্থাৎ "তখন কী অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে তাদের নবীকে তাদের জাতির সামনে উপস্থিত করে সেই জাতির হিসাব নেবো এবং তোমাকেও তোমার জাতির সামনে উপস্থিত করে তাদের হিসাব নেবো?" তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, থামো, থামো! সাহাবী বলেন, আমি যখন তাঁর দিকে তাকালাম তখন দেখলাম, তাঁর দুই চোখ বেয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছে। তাঁর ওপর গভীর খোদাভীতি ছেয়ে যায়। সেই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবেই তাঁর মনে উম্মতের চিন্তাও ছিল যে, আমার উম্মত যেন এমন কোনো কাজ না করে বসে যা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে এবং তখন আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ের একটি দিক হলো, যেখানে তাঁর সাক্ষ্য দেবার জন্য আরো অনেক বিষয় রয়েছে, সেখানে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর সাক্ষ্য যেন আমাদের বিরুদ্ধে না যায়। আমাদের অবস্থা যেন এমন না হয় যা আমাদের গুনাহসমূহকে ফুটিয়ে তুলবে এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির সম্মুখীন হব।

অতএব, এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। আমাদেরও ইবাদতের হক আদায় করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সেই ভালোবাসা রাখা করা উচিত যা মহানবী (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে আমাদেরকে যার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিয়মিত নামাযের বিষয়টিই দেখুন, এর প্রতি তাঁর (সা.) এতটাই খেয়াল ছিল যে, চরম অসুস্থ অবস্থায় জীবনের শেষ দিনগুলোতেও যখন শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি থাকে, ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে গিয়েছেন। একদিন যখন তিনি আসতে পারেন নি, তখন তিনি হযরত আবু বকরকে (রা.) নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। এরই মাঝে তিনি যখন দেখলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে, তৎক্ষণাৎ দুইজন মানুষের সাহায্য নিয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সেই সময়ও অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর দুই পা মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব তাঁর দৃষ্টিপটে ছিল। তিনি উম্মতকে এটি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি সেই কষ্ট সহ্য করেছেন। পা টেনে টেনে তিনি সেখানে পৌঁছেন। মসজিদে চলে যান, নিজের অসুস্থতার পরোয়া করেন নি। অতএব এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসার চিত্র।

আর এই প্রসঙ্গে তিনি মানুষের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণও কীভাবে করতেন! একটি তো হলো নিয়মিত নামাযের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ, আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য ও তাঁর মর্যাদা মানুষের হৃদয়ে কীভাবে গেঁথে দিতে হয়। আরবদের মাঝে রীতি ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তালি বাজানো হতো। সেই যুগে এটি একটি সাধারণ রীতি ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) এই প্রথা বিলুপ্ত করে বলেন, এর পরিবর্তে যিকরে ইলাহী বা আল্লাহ্র স্মরণ হওয়া উচিত।

এই বিষয়ে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোনো একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ইতোমধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, আবু বকরকে বলো, নামায পড়িয়ে দিতে। এরই মাঝে তিনি (সা.) সেই কাজ শেষ করেন এবং তৎক্ষণাৎ মসজিদের দিকে রওয়ানা হন। যখন তিনি মসজিদে পৌঁছেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়াচ্ছিলেন। যখন লোকেরা বুঝতে পারে যে, তিনি (সা.) মসজিদে এসে গেছেন, তখন মুসল্লিরা ব্যাকুল হয়ে হাততালি দিতে আরম্ভ করে। এর মাধ্যমে একদিকে তো এটি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনে তাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ, আর অন্যদিকে হযরত আবু বকর (রা.)-র দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, এখন আপনার ইমামতি শেষ হয়ে গেছে, কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত হয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) পেছনে সরে আসেন আর মহানবী (সা.)-এর জন্য ইমামের স্থান ছেড়ে দেন। নামাযের পর মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর! আমি তোমাকে নামায পড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছি, তাই পেছনে আসার হেতু কী? হযরত আবু বকর (রা.)-র নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখুন! তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্র রসূলের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্র এমন কী মর্যাদা রাখে যে, নামায পড়াবে? অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের হাততালি দেবার উদ্দেশ্য কী ছিল? আল্লাহ্র যিকর বা ইবাদতের সময় হাততালি দেওয়া সংগত নয়। নামাযে যদি এমন কোনো বিষয় ঘটে যেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক হয়, তখন হাততালি দেবার পরিবর্তে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করো; **'সুবহানাল্লাহ্'** বলা উচিত। তোমরা এমনটি করলে স্বভাবতই অন্যদের মনোযোগ সেই ঘটনার প্রতি নিবদ্ধ হবে।

একইভাবে তিনি (সা.) কৃত্রিম ইবাদতও পছন্দ করতেন না। ইবাদতের প্রতি এত মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, কৃত্রিমতা থাকা উচিত নয়। একবার তিনি (সা.) বাড়িতে গিয়ে দেখেন, দুই খুঁটির মাঝে একটি রশি ঝুলছে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এই দড়ি কেন বাঁধা হয়েছে? লোকেরা বলে, এটি হযরত যয়নব (রা.)-র দড়ি। ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি এই দড়িতে ভর দিয়ে ইবাদত করেন। মহানবী (সা.) বলেন, এমনটি করা উচিত নয়; এই দড়ি খুলে ফেলো। প্রত্যেকের উচিত ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত করা যতক্ষণ সে স্বাচ্ছন্দ্যে করতে পারে। ক্লান্ত হয়ে গেলে যেন সে বসে যায় বা বিশ্রাম নেয়। এ ধরনের কৃত্রিম ইবাদত কোনো কাজে আসে না। এর মাধ্যমে প্রথমত এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর (সা.) তরবিয়তের প্রভাবে নারী সাহাবীগণ এবং তাঁর (সা.) পরিবার-পরিজন ও বাড়ির সদস্যরাও ইবাদতের প্রবল আগ্রহ রাখতেন আর নিজেদেরকে কষ্টেও নিপতিত করতেন। অপরদিকে তিনি (সা.) এটিও বলেছেন, (নিজেকে) কষ্টে নিপতিত করার প্রয়োজন নেই, বরং স্বাচ্ছন্দ্যের সীমায় থেকে ইবাদত করো। তবে বর্তমান যুগের মানুষের জন্য এটিও বলে দিচ্ছি, এর অর্থ এটিও নয় যা বর্তমান যুগের লোকেরা কখনও কখনও বলে থাকে যে, **কষ্টে নিপতিত করার কোনো প্রয়োজন নেই, দ্রুত নামায পড়ো। ফরয ইবাদত যেহেতু, তাই কোনোমতে পালন করো, ঘাড় থেকে বোঝা নামাও!** আর [মহানবী (সা.)-এর] এই কথাটির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে যে, নিজের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য রাখো। বর্তমানে কোনো কোনো নামাযী ইবাদত করতে আসে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে নামায পড়ে চলে যায়। অথবা বাড়িতে নামায পড়ার সময় কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে ফেলে। প্রায়শ এখানেও মানুষ আমাকে প্রশ্ন করে, নামায কীভাবে পড়া উচিত? নামায মনোযোগের সাথে ও সুন্দরভাবে পড়া উচিত। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস আছে, তিনি (সা.) একজন সাহাবীকে (একই) নামায তিন-চার বার পড়ার জন্য আদেশ দেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে বিলম্বে এসেছিলেন। তিনি (সা.) নামায পড়ে বৈঠকে বসেছিলেন, বাজামা'ত নামায শেষে বৈঠক শুরু হয়েছিল। প্রত্যেকবার সেই সাহাবী নামায শেষ করে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসলে তিনি (সা.) তাকে বলতেন, যাও! পুনরায় নামায পড়ো। পুনরায় সে নামায পড়ে আসলে তিনি (সা.) বলতেন, যাও! আবার নামায পড়ো। এভাবে তিন-চার বার তিনি (সা.) তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। সেই সাহাবী যখন নিবেদন করেন, এর চেয়ে উত্তমভাবে নামায পড়ার পদ্ধতি আমি জানি না; আপনি আমাকে বলুন, কীভাবে পড়তে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, নামায ধীরেসুস্থে ও বুঝেশুনে পড়ো। আল্লাহ্‌র যিকর করো, দরূদ পাঠ করো, তৌহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ঘোষণা ও গুণকীর্তন করতে হবে। রুকু ও সিজদাও সঠিকভাবে করা উচিত। কাজেই এ কথাটিও স্মরণ রাখুন। স্বাচ্ছন্দ্যে নামায পড়ার অর্থ এটি নয় যে, (এই যুক্তিতে) দ্রুত (নামায) পড়ে নেবে যে, একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্যে নামায পড়ো। আমার ঘুম পাচ্ছিল তাই আমি দ্রুত কয়েক মিনিটে নামায পড়ে নিয়েছি! অসচেতন অবস্থায় তো এমনিতেই নামায পড়া বারণ। এমনটি সংগত নয়। বরং যখন নামায পড়বে তখন এর দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতে হবে; এরও তিনি (সা.) উপদেশ দিয়েছেন।

শিরকের প্রতি তাঁর এতটা ঘৃণা ছিল যে, মৃত্যুকালে তিনি (সা.) যখন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে কষ্টে ছটফট করছিলেন, তখন তিনি কখনো ডানে আবার কখনো বাম পাশে ফিরছিলেন এবং ক্রমাগতভাবে বলছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি অভিসম্পাত করুন যারা তাদের নবীদের সমাধিকে মসজিদে পরিণত করেছে; অর্থাৎ তারা নবীদের কবরে

সিজদা করে এবং তাঁদের কাছে দোয়া বা যাচনা করে। তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমার মৃত্যুর পর আমার জাতি যদি এমন কাজ করে তাহলে যেন এটি মনে না করে যে, তারা আমার দোয়ার ভাগীদার হবে; বরং আমি তাদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হব। যেমনটি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সাক্ষী বানাবেন। এখন লক্ষ করুন! এ কারণেই মদীনায় তাঁর পবিত্র মাজারে সরকার কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে, কাউকেই সিজদা করতে দেয় না, এমনকি কাছেও ভিড়তে দেয় না, কিন্তু অনেক মুসলমান দেশে পীর-ফকিরদের দরবারে সিজদা দেওয়া হয় এবং বুযুর্গদের কাছে মানত করা হয়। এই আচরণ হলো শিরক। যে কাজ করতে মহানবী (সা.) বারণ করেছেন এবং নিজের বেলায়ও বারণ করেছেন, তাহলে অন্য কোনো পীর-ফকির অথবা বুযুর্গদের কী এমন অধিকার রয়েছে যে, তাদের সমাধিতে সিজদা করতে হবে? আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার মাধ্যমে এসব কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি বটে, কিন্তু ইবাদতের প্রকৃত মানে উপনীত হওয়া এখনো বাকি। কিন্তু অন্য মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক হারে এই প্রথা প্রচলিত আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিও করুণা করুন এবং তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা এই শিরক থেকে বিরত থাকতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনয়ের মান দেখুন, যখন লোকজন তাঁকে (সা.) বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো আপনার আমল বা কর্মের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করবেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে (চারিত্রিক) সনদ প্রদান করেছেন ও আপনার অনুপম চরিত্রের প্রশংসা করেছেন এবং আপনার জীবনার্দশকে মুসলমানদের আমলের একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। কাজেই এর অর্থ হলো, আপনার কর্ম এমন যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন অথবা ক্ষমা করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, **না না! আমিও আল্লাহ্র অনুগ্রহেই ক্ষমা লাভ করব**। আবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, **আমি একদিন মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সা.) বলছিলেন, কোনো মানুষ তার কর্মের দরুন জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনিও কি আপনার কর্মের কল্যাণে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না? তিনি (সা.) বলেন, আমিও নিজের কর্মবলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তবে যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ আমাকে আবৃত করে নেয়, তাহলে সেটি ভিন্ন কথা**। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

এরপর তিনি (সা.) উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, **নিজের কর্মকাণ্ডে পুণ্য অবলম্বন করো এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পথ অন্বেষণ করো**। আরো বলেন, **তোমাদের মধ্যে কোনো মানুষ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে জীবদ্দশায় সে নিজের পুণ্যে আরো অগ্রগামী হবে আর যদি খারাপ (মানুষ) হয় তাহলে বেঁচে থেকে সে তার পাপ থেকে তওবা করার সৌভাগ্য লাভ করবে,** (এ বিষয়ে) মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। কখনো মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়। এর কারণ তিনি (সা.) এটি বর্ণনা করেছেন যে, **যদি কোনো কষ্টের কারণে তুমি এই কাজ করো;** [কারণ কোনো কষ্টের ফলেই সাধারণত মানুষ মৃত্যু কামনা করে থাকে;] **আর তোমার মধ্যে যদি কোনো পুণ্য থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে আরো অধিক পুণ্য করার তৌফিক দান করবেন আর পরকালে তোমার জন্য আরো উত্তম ব্যবস্থা করবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি কোনো পাপের অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে তোমরা তওবা ও ইস্তেগফারের সুযোগ লাভ করবে** যদি এদিকে

তোমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, আর পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে; এভাবেও তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করবে। আর যখন সময় আসবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাথে এমন ব্যবহার করবেন যে, হয়ত তোমাদের মার্জনার উপকরণও সৃষ্টি হয়ে যাবে।

তাঁর (সা.) নিজের ইবাদতের মান কেমন ছিল তা তো আমরা দেখলাম। এছাড়া তিনি (সা.) অন্যদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একবার তিনি (সা.) রাতের বেলা তাঁর জামাতা হযরত আলী এবং কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-র বাড়ি যান এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, **তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়ো তো?** হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা তো করি, কিন্তু যখন আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমাদের চোখ না খোলে তখন তাহাজ্জুদ পড়া হয় না। তিনি (সা.) বলেন, তাহাজ্জুদ পড়বে; আর একথা বলে নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি (সা.) বার বার এ কথাই বলতে থাকেন وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (সূরা আল্-কাহাফ: ৫৫) অর্থাৎ, **মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করে**। অতএব, তিনি (সা.) একথা তাদের সামনেও বলেন, তাদেরকে বুঝান আর ফেরত আসার সময়েও একথা পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, যেন অন্যরাও হযরত আলী (রা.)-র কাছে একথাটি পৌঁছে দেয়। তিনি (সা.) তাদেরকে এ শিক্ষাই দেন যে, এ কথা বলার পরিবর্তে তাদের বলা উচিত ছিল, কখনো কখনো আমাদের ভুল হয়ে যায়, তখন আমরা উঠতে পারি না। কিন্তু তারা এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার ওপর চাপিয়ে দেন যে, যদি আল্লাহ্ চান তাহলে আমরা জাগ্রত হই, নতুবা আমরা ঘুমিয়ে থাকি। তিনি এটিই বলতে চেয়েছেন যে, নিজের দোষ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করা উচিত নয়?

যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোনো ধরনের কৃত্রিমতা বা ভনিতা তাঁর পছন্দ ছিল না। যেমনটি একবার তিনি (সা.) নিজের বাড়িতে দড়ি টাঙানো দেখতে পেয়ে তাদেরকে এমনটি করতে বারণ করে বলেন, এই দড়ি খুলে ফেলো। তাঁর নীতি বা আদর্শ ছিল, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে যে শক্তিসামর্থ্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিত আর এটিই প্রকৃত ইবাদত। দৃষ্টিশক্তি থাকা অবস্থায় চোখ বন্ধ করে নেওয়া বা সেটি উপড়ে ফেলা (কোনো) ইবাদত নয়, বরং এটি একটি অসম্মানজনক আচরণ। তবে এর অপব্যবহার হচ্ছে পাপ। বর্তমানে দেখুন! পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, মানুষের কামনাবাসনা রয়েছে, বিভিন্ন আকর্ষণ রয়েছে যা আমাদেরকে সেগুলোর দিকে আকর্ষণ করে। আমরা যদি সেগুলোর প্রতি আকর্ষণ রাখি, যেমন বিভিন্ন নোংরা অনুষ্ঠান টিভি বা ইন্টারনেটে দেখি অথবা কোনো অসমীচীন প্রোগ্রাম দেখি, তাহলে এটি পাপ। তিনি (সা.) বলেছেন, এই পাপ থেকে দূরে থাকাই মূল কাজ আর এটিই তোমাদেরকে পুণ্যের ভাগীদার বানাবে। একইভাবে কান বন্ধ করে রাখা কোনো পুণ্যকাজ নয়। আল্লাহ্ তা'লা যে ইন্দ্রিয় শক্তি দিয়েছেন, সেটি কেন নষ্ট করবে? বরং এটি তো এক প্রকার ধৃষ্টতা। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে একটি নিয়ামত দিয়েছেন, অথচ তোমরা সেটি নষ্ট করছ। তবে মানুষের গীবত ও পরচর্চা শ্রবণ করা পাপ। এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা অন্যের গীবত করেও এবং পরনিন্দা শোনেও, মানুষের সম্পর্কে ভ্রান্ত কথা শোনে এবং আনন্দ পায়, উপভোগ করে, মানুষের দুর্বলতা এবং মন্দ কথা শুনে বিদ্রুপও করে। এসব কাজ অন্যায় এবং পাপ। এ সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, এমন কাজ করবে না। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্প্রদত্ত শক্তিবৃত্তির সঠিক ব্যবহারের নামই হচ্ছে উন্নত নৈতিক চরিত্র আর এই স্বভাবজ শক্তিনিচয়কে

বিনষ্ট করা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। এগুলোকে অন্যায় কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে পাপ আর এগুলোর প্রকৃত ও যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে পুণ্য। এটি হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার সারমর্ম এবং এটিই তাঁর নিজের জীবনের সারাংশ। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আদর্শ হিসেবে এটিকে [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শকে] অবলম্বন করো।

হযরত আয়েশা (রা.) এক স্থানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে বলেন, তাঁর (সা.) জীবনে কখনো এমন কোনো পরিস্থিতি আসে নি যেখানে তাঁর (সা.) সামনে দুটি পথ খোলা ছিল আর তিনি সেগুলোর মধ্য থেকে সহজ পথটি বেছে নেন নি– যতক্ষণ না সেই সহজ পথে কোনো পাপের আশঙ্কা থাকত। অর্থাৎ যখন দুটি পথ থাকত– একটি সহজ ও একটি কঠিন– তখন তিনি সহজ পথটিই গ্রহণ করতেন। কারণ আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে অকারণে কষ্টে ফেলতে চান না। কিন্তু যখনই তাঁর (সা.) মনে সামান্যতম সন্দেহ হতো যে, সহজ পথটি অবলম্বন করলে কোনো পাপ সংঘটিত হতে পারে, তখন তিনি তা এড়িয়ে কঠিন পথটি বেছে নিতেন। বরং বলা যায়, সামান্য সন্দেহ হলেই তিনি এমনভাবে তা থেকে দূরে সরে যেতেন যে, মানুষের মধ্যে কেউই তাঁর মতো এতটা দূরে সরে যাবার চেষ্টা করার সামর্থ্যই রাখত না। তিনি এতটা সতর্ক ছিলেন।

এখন দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক সময় মানুষ অন্যদের ধোঁকা দেবার জন্য নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টের মধ্যে ফেলে নিজের বড়াই জাহির করতে চায় যে, আমরা কত চেষ্টাসংগ্রাম করছি, হেন করেছি তেন করেছি! অনেক পীর-ফকিরও এ ধরনের কথা বলে; নানা কাহিনি রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) সহজ পথই অনুসন্ধান করেছেন। কারণ যারা পৃথিবীকে দেখানোর জন্য এভাবে কথা বলে এবং নিজের বড়োত্ব জাহির করার জন্য কিংবা প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে কষ্টে নিপতিত করে থাকে, তারা আল্লাহ্র জন্য তা করে না। আল্লাহ্ তা'লারও তাদের কষ্টবরণে কিছু যায়-আসে না, আর তারা এর জন্য কোনো পুণ্যেরও ভাগীদার হয় না। এসব মূলত মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য করা হয়। আর মানুষ যখন ধোঁকা দেবার অভিপ্রায়ে কোনো কাজ করে তখন সেই দুরভিসন্ধির কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পুণ্যের নয় বরং পাপের ভাগীদার করেন। কিছু মানুষ তাদের দোষত্রুটি ঢাকার জন্য অনেক ঢাকঢোল পেটায় যে, আমরা এই করেছি, সেই করেছি। কোনো না কোনোভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে এবং নিজেদের প্রশংসা করে বলে যে, আমরা মস্ত বড়ো কাজ করেছি এবং এ কারণে আমরা ভীষণ কষ্টের মধ্যে পড়েছি। এরা এসব কাজের ঘটা করে প্রচার করে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, না, এই (তথাকথিত) পুণ্য কাজগুলো আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করবে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। কারণ তোমাদের নিয়ত বা সংকল্প পরিষ্কার নয়। তোমরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য এমনসব কাজ করে ফেলো। তোমরা মনে করো, আমরা মানুষকে দেখাতে পারলে হয়ত লোকেরা আমাদের পক্ষ নেবে। সুতরাং এসব ছোটো ছোটো শিক্ষা মহানবী (সা.) আমাদেরকে তাঁর আদর্শের মাধ্যমে এবং উপদেশের মাধ্যমেও শিখিয়েছেন। মানুষের সাথে উত্তম আচরণের বিষয়টি তিনি নিজের পরিবার থেকেই শুরু করতেন। তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ কেমন ছিল? অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ও ন্যায়সংগত আচরণ ছিল। বর্তমান যুগের মানুষ যদি এটি হৃদয়ঙ্গম করে, তাহলে পারিবারিক বহু ঝগড়া ও অশান্তি দূর হয়ে যাবে। কখনো কখনো তাঁর স্ত্রীরা তাঁর সঙ্গে কঠোরতাও করতেন, অর্থাৎ কঠোরভাবে কথা বলতেন, অসন্তুষ্টি নিয়ে কথা বলতেন; কিন্তু তিনি (সা.) তা নীরবে হাসিমুখে এড়িয়ে যেতেন।

একদিন মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, হে আয়েশা! তুমি যখন আমার সাথে রাগ করো তখন আমি বুঝে ফেলি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আপনি কীভাবে বুঝে ফেলেন? তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো তখন কসম করার প্রয়োজন হলে সর্বদা বলো, মুহাম্মদের প্রতিপালক-প্রভুর কসম! আর যখন তুমি আমার ওপর রাগ করো এবং কসম করার দরকার হয় তখন বলো, ইবরাহীমের প্রতিপালক-প্রভুর কসম! একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) হেসে ফেলেন এবং তাঁর (সা.) কথার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আপনি একেবারে ঠিক ধরেছেন।

এরপর মহানবী (সা.)-এর প্রথম ও জ্যেষ্ঠতমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.)-র ঘটনাবলি রয়েছে। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তার (রা.) মৃত্যুর পরে মহানবী (সা.) যুবতী মহিলাদের সাথেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-র স্মৃতি ভোলেন নি। হযরত খাদীজা (রা.)-র বান্ধবীরাও যখন ঘরে আসতেন মহানবী (সা.) তাঁদের স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেন আর হযরত খাদীজা (রা.)-র হাতের তৈরি কোনো জিনিস তাঁর (সা.) কাছে এলে অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতেন। বদরের যুদ্ধের ঘটনা। তাঁর (সা.) এক জামাতা বন্দি হয়ে আসেন; তিনি তখনো মুসলমান হন নি। আর মুক্তিপণ পরিশোধ করার মতো সম্পদ তার কাছে ছিল না। তার স্ত্রী অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কন্যা যখন দেখলেন, আমার স্বামীকে রক্ষা করার জন্য আর কোনো সম্পদ নেই, তখন একান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি তার কাছে থাকা মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন গলার একটি হার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে মদীনা পাঠিয়ে দেন। সেই হারটি যখন মহানবী (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি (সা.) তা দেখে চিনে ফেলেন এবং অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন, আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি না, কারণ এমন আদেশ দেবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমি জানি, গলার এই হারটি যয়নবের কাছে থাকা তার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তোমরা যদি সানন্দে সম্মত হও তবে আমি সুপারিশ করছি, কন্যাকে তার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু থেকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। সাহাবীরা (রা.) জবাবে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের জন্য এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে? কাজেই তারা (রা.) গলার সেই হারটি হযরত যয়নবকে (রা.) ফিরিয়ে দেন।

হযরত খাদীজা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে যে সদ্ব্যবহার করেছিলেন তার প্রভাব এত সুগভীর ছিল যে, তিনি (সা.) প্রায়ই স্ত্রীদের কাছে তার (রা.) কথা বর্ণনা করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রীদের মাঝে পারস্পরিক সামান্য মনোমালিন্য দেখা দেয়। [একজন স্ত্রী প্রয়াত হলেও তার যদি বেশি প্রশংসা করা হয় তাহলে অন্যরা ঈর্ষান্বিত হয়।] মহানবী (সা.) একবার হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে হযরত খাদীজা (রা.) প্রশংসা করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কেন এই বৃদ্ধার কথা সবসময় স্মরণ করতে থাকেন? এখন তার (রা.) কথা বাদ দিন! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তার (রা.) চেয়ে উত্তম যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীদের দান করেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি (সা.) বলেন, আয়েশা! তুমি জানো না, খাদীজা আমার কী পরিমাণ সেবা করেছে!

মহানবী (সা.)-এর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণগত মান কেমন ছিল– তা ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের সামনে আসে। তাঁর (সা.) জন্মের পূর্বে পিতা আর পরে শৈশবেই মাতা মৃত্যুবরণ করেন। প্রথম আট বছর তিনি (সা.) তাঁর দাদার তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত

হন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে লালিতপালিত হন। চাচার সাথে রক্তের সম্পর্কও ছিল এবং তার (অর্থাৎ আবু তালিবের) পিতাও মৃত্যুকালে মহানবী (সা.)-এর স্বপক্ষে বিশেষভাবে ওসিয়্যত করেছিলেন। একারণে তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা রাখতেন আর তাঁর (সা.) প্রতি যত্নবান ছিলেন। কিন্তু চাচির মাঝে সেরূপ স্নেহবৎসলতা কিংবা বংশকুলের প্রতি দায়িত্ববোধ ছিল না। ঘরে কোনো জিনিস আসলে চাচি প্রায়শই নিজ সন্তানদের প্রথমে দিতেন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি খেয়াল রাখতেন না। অথচ তিনি (সা.) তখনো শিশুই ছিলেন। আবু তালিব বাড়ি ফিরলে ভাতিজাকে কান্নারত অবস্থায় দেখা অথবা অভিযোগ-অনুযোগ করতে দেখার পরিবর্তে দেখতে পেতেন, তার নিজের সন্তানরা কোনো না কোনো খাবার খাচ্ছে, অথচ তার ছোট্টো ভাতিজা পাহাড়ের মতো গাম্ভীর্য নিয়ে এক কোণায় বসে আছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সবকিছু সহ্য করতেন। চাচার স্নেহ ও পারিবারিক দায়িত্ব যখন সামনে এসে দাঁড়াতো তখন তাঁর (সা.) চাচা দৌড়ে ভাতিজাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং বলতেন, আমার সন্তানটির দিকেও একটু খেয়াল কোরো! আমার সন্তানটির প্রতিও একটু খেয়াল রেখো!' প্রায়শ এমনটি ঘটত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লেখেন, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনো অভিযোগ করেন নি, তাঁর চেহারায় কখনো বিষণ্ণতার ছাপ দেখা যায় নি। এ কারণে তিনি খিটখিটেও হন নি এবং নিজের চাচাতো ভাইদের সঙ্গে কখনো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁর হয় নি। বরং তাঁর জীবনই সাক্ষ্য দেয়– পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি হযরত আলী ও হযরত জাফরকে নিজের তত্ত্বাবধানে লালনপালন করেন এবং সর্বতোভাবে তাঁদের কল্যাণের ব্যবস্থা করেন।

বর্তমান যুগের সাথে তুলনা করে দেখুন, মানুষ বড়ো হয়ে যাবার পরও ছোটোবেলার কথা মনে রেখে প্রতিশোধ নিতে থাকে; কিন্তু তিনি (সা.) সর্বদা উত্তম আচরণই প্রদর্শন করেছেন। বর্তমানে আমরা দেখি, এমনকি বড়ো হয়ে বোঝার বয়সে পৌঁছেও কেউ যদি বাধ্য হয়ে অন্য আত্মীয়দের কাছে থাকতে যায়, অনেক সময় বাবা না থাকায় চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই থাকতে হয় বা অন্য কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে থাকতে হয়; সেখানে যদি আত্মীয়দের পক্ষ থেকে কোনো অবিচার হয়, তবে তারা সেসব কথা ভুলতে পারে না এবং সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিতে থাকে। কিন্তু মহানবী (সা.) কখনো প্রতিশোধ নেন নি, বরং সুযোগ পেলে তাদেরকে নিজের বুকে স্থান দিয়েছেন, তাদের লালনপালন করেছেন এবং তাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দিয়েছেন।

উচ্চ নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধৈর্যের একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন। একবার এক নারী– যার ছেলে মারা গিয়েছিল এবং সে তার কবরের পাশে বসে মাতম করছিল। মহানবী (সা.) সেই পথে যাবার সময় বলেন, হে নারী! ধৈর্য ধরো। সবার ওপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রাধান্য রাখে। সেই নারী মহানবী (সা.)-কে চিনত না। সে জবাবে বলল, আমার সন্তানের মতো যদি তোমার সন্তানও মারা যেত, তবে তুমি বুঝতে ধৈর্য কাকে বলে! তখন মহানবী (সা.) শুধু এতটুকু বলে সেখান থেকে চলে যান যে, একটি নয়– আমার সাত সাতটি সন্তান মারা গেছে!

অতএব এমন পরিস্থিতিতে তথা অতীতের দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করে শুধু এতটুকুই প্রকাশ করতেন, কিন্তু কখনো এর বেশি কিছু বলেন নি। আর সেই শোকের কারণে কখনোই মানবসেবায় অবহেলা করেন নি।

মহানবী (সা.)-এর সহনশীলতার স্বরূপ দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে শাসনক্ষমতা দান করেন তখনো তিনি সবার কথা শুনতেন। কেউ কঠোর আচরণ করলেও তিনি নীরব থাকতেন এবং কখনো কঠোরতার জবাব কঠোরভাবে দিতেন না। ইতিহাসে লেখা আছে, মুসলমানরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নাম ধরে না ডেকে তাঁর আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা দৃষ্টিপটে রেখে 'হে আল্লাহ্র রসূল' বলে ডাকতেন। আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সে সময়কার রীতি অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করত; তাঁকে 'মুহাম্মদ' বলে না ডেকে 'আবুল কাসেম' (অর্থাৎ কাসেমের পিতা) বলে ডাকত, যা ছিল তাঁর ডাক নাম। কারণ তাঁর এক পুত্রের নাম কাসেম ছিল– যিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। একবার এক ইহুদী মদীনায় এসে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক শুরু করে। বিতর্কের সময় সে বার বার বলছিল, হে মুহাম্মদ! কথাটা এরূপ; হে মুহাম্মদ! বিষয়টা এরূপ। মহানবী (সা.) নিঃসংকোচে তার কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাহাবীরা তার এই ধৃষ্টতা দেখে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এক সাহাবী নিজেকে সংযত করতে না পেরে ইহুদীকে বলেন, সাবধান! নাম ধরে কথা বোলো না। যদি 'রসূলুল্লাহ্' বলতে না পারো, তবে অন্তত 'আবুল কাসেম' বলে ডাকো। তখন সেই ইহুদী বলে, আমি তো সেই নামই বলব যা তাঁর মা-বাবা রেখেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুচকি হেসে সাহাবীদের বলেন, সে ঠিক বলছে। আমার পিতা-মাতা আমার নাম মুহাম্মদই রেখেছিলেন। যে নামে সে ডাকতে চায় তাকে ডাকতে দাও এবং তার প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ কোরো না।

ধৈর্যের এমন সুউচ্চ মান ছিল যে, কখনো কখনো তিনি কোনো কাজের জন্য বাহিরে বের হতেন, তখন কিছু লোক তাঁর পথরোধ করে নিজেদের চাহিদা বর্ণনা করা আরম্ভ করত। সে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের কথা শেষ না করত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর তিনি এগিয়ে যেতেন। আবার কিছু লোকের অভ্যাস ছিল করমর্দন করলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হাত ধরে রাখত। তিনিও (সা.) তাদের হাত দীর্ঘ সময় ধরে রাখতেন। যদিও এটি কোনো পছন্দনীয় রীতি নয়, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনো নিজের হাত তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতেন না। সব ধরনের প্রার্থীরা নিজেদের চাহিদা তাঁর (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করত। কখনো কখনো তিনি (সা.) প্রত্যাশীকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু দিয়ে দিতেন, তখন সে নিজের লোভের বশবর্তী হয়ে আরো বেশি দাবি করত। তিনি (সা.) তাদের সেই প্রত্যাশাও পূরণ করতেন। কখনো কখনো লোকেরা ক্রমাগতভাবে চাইতে থাকত এবং তিনি প্রত্যেকবার তাদেরকে কিছু না কিছু দিতে দিতেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রার্থীদের মাঝে যাদের বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান মনে হতো, তাদের চাহিদা অনুযায়ী দিয়ে দেবার পর সেই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে শুধু এতটুকু বলতেন, যদি তুমি আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখতে তাহলে বেশি ভালো হতো। একবার একজন সাহাবী ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করে কয়েকবার নিজের প্রয়োজনের জন্য অর্থ চাইলেন। তিনি (সা.) তার দাবি পূরণ করলেন ঠিকই, কিন্তু শেষে বললেন, সর্বোত্তম মর্যাদা হলো মানুষের আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করা। সেই সাহাবীর মাঝে নিষ্ঠা ছিল এবং ভদ্রতাও ছিল; যা কিছু তিনি নিয়েছিলেন ভদ্রতার কারণে সেটি ফেরত দেন নি, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই চাওয়াই আমার শেষ চাওয়া। ভবিষ্যতে আমি আর কারো কাছে কখনো কিছু চাইব না।

এই সাহাবী সম্পর্কে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, একবার যুদ্ধ চলছিল, যুদ্ধের পরিস্থিতি খুবই ভয়ংকর ছিল; যুদ্ধক্ষেত্রে তির বর্ষণ করা হচ্ছিল, তরবারি চলছিল, বর্শা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল; সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ চলছিল এবং হতাহত হচ্ছিল। ঠিক সে সময় যখন তিনি শত্রুপরিবেষ্টিত ছিলেন, তখন তার হাত থেকে একটি চাবুক পড়ে যায়। তার দলের একজন পদাতিক

মুসলমান সৈনিক মনে করেন, অফিসার নীচে নামলে আবার ক্ষতি না হয়ে যায়– একথা ভেবে ঝুঁকে চাবুক তুলতে চাইলেন যেন তার হাতে তা তুলে দিতে পারেন। সেই সাহাবীর দৃষ্টি সেই সৈনিকের ওপর পড়ে এবং তিনি বলেন, হে আমার ভাই! আল্লাহ্‌র দোহাই, তুমি চাবুকটি স্পর্শ কোরো না! একথা বলে তিনি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামেন এবং চাবুক তুলে নেন। এরপর তিনি নিজ সাথিকে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম, আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাইব না। যদি আমি তোমাকে চাবুক তুলতে দিতাম, তাহলে মুখে তোমার কাছে কিছু না চাইলেও এতে সন্দেহের কি কোনো অবকাশ রয়েছে যে, কার্যত এটি চাওয়াই গণ্য হতো? আর এমনটি করা আমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বানিয়ে দিত। যদিও এটি যুদ্ধক্ষেত্র, কিন্তু আমি নিজের কাজ নিজেই করব। এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতেও নিজের অঙ্গীকারের কথা তার স্মরণ ছিল। সুতরাং এটি এবং এটি ছাড়াও মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আরো অনেক বিষয় রয়েছে– ন্যায়বিচারের ব্যাপারে, আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে, দরিদ্রদের দেখাশোনা করার ব্যাপারে– যেগুলো আমাদের জন্য আদর্শ। দরিদ্রদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে, নারীদের সাথে উত্তম আচরণের বিষয়ে; যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, বাড়িতে স্ত্রীদের সাথে এবং সাধারণ নারীদের সাথেও তিনি (সা.) উত্তম ব্যবহার করতেন; মানবজাতির সেবার ব্যাপারে, প্রতিবেশী এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহারের ব্যাপারে অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা মহানবী (সা.)-এর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই। মানুষের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি (সা.) কতটা সচেষ্ট থাকতেন, অন্যের দোষক্রুটি গোপন রাখার স্বার্থে তিনি কীভাবে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতেন, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে তিনি কী বলতেন আর তাঁর (সা.) ব্যবহারিক আচরণ কেমন ছিল, তিনি (সা.) কীভাবে (অন্যের) ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করতেন, কীভাবে ভুলক্রুটি ঢেকে রাখতেন, সত্য বলার বিষয়ে কী কী উপদেশ প্রদান করতেন, কুধারণা করা থেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে তিনি কী বলেছেন, গোয়েন্দাগিরি করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে তিনি কী বলেছেন, হতাশা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে কী বলেছেন, এমনকি জীবজন্তুর সাথেও উত্তম আচরণ করতে বলেছেন এবং পারস্পরিক ধর্মীয় সহনশীলতা সম্পর্কেও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। এই সবগুলো বিষয় এমন যা আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ অনুকরণীয় আদর্শ। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, ভবিষ্যতে এ বিষয়গুলো আমি সময়-সুযোগ মতো বর্ণনা করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্। এখন এ বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত করছি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করছি। তিনি (আ.) বলেন,

সেই মানব যিনি নিজ সত্তা ও গুণাবলি, নিজ কর্ম ও আদর্শের মাধ্যমে এবং প্রবল বেগে ধাবমান নদীর ন্যায় স্বীয় আধ্যাত্মিক ও পবিত্র শক্তির মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে এবং সততা ও অবিচলতার সাথে পরিপূর্ণতার পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং 'পরিপূর্ণ মানব' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন, সেই কল্যাণমন্ডিত নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া (পবিত্রদের নেতা), রসূলগণের মোহর ও গৌরব জনাব হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হে খোদা, হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি সেই আশিস ও দরূদ বর্ষণ করো যা তুমি সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত কারো প্রতি বর্ষণ করো নি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামর্থ্য দান করুন, আমরা যেন তাঁর (সা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমান হবার জন্য সচেষ্ট হই আর তাঁর (সা.) এই বাণীকে পৃথিবীময় প্রচারে সচেষ্ট হই, যেন পৃথিবীকেও তাঁর (সা.)-পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হই।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

নামাযের পর আমি জানাযার নামাযও পড়াবো। জানাযা এসেছে কি? একটি হবে হাযের জানাযা। এটি জনাব লাইক আহমদ তাহের সাহেবের জানাযা, যিনি যুক্তরাজ্যের মুরব্বী সিলসিলা ছিলেন। সম্প্রতি তিরাশি বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি এক কন্যা ও তিন পুত্র রেখে গেছেন।

লাইক তাহের সাহেব কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী হযরত শেখ ফযল আহমদ বাটালভী সাহেবের (রা.) ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। মেট্রিক পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের পর লাইক সাহেব ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জীবন উৎসর্গ করেন ও জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জামেয়া পাঠ সমাপ্ত করেন এবং জামেয়ায় অধ্যয়নকালেই তিনি এফ.এ পাশ করেন এবং আরবীতে **'আদীব ফাযেল'** ডিগ্রি অর্জন করেন। জামেয়া থেকে পাশ করার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ ডিগ্রিও লাভ করেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় এবং লন্ডনে অবস্থিত এখানকার ফযল মসজিদের নায়েব ইমাম হিসেবে তার সেবা প্রদানের সৌভাগ্য হয়। অতঃপর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান ফেরত যান। তিনি ইসলাহ ও ইরশাদ দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থানে মুরব্বী হিসেবে সেবা প্রদান করতে থাকেন। অতঃপর ওয়াকালতে তাসনীফ-এ (পুস্তক রচনা ও প্রণয়ন দপ্তরে) তার বদলি হয়। তিনি মওলানা আব্দুল হামিদ নূরুল হক সাহেবের জামাতা ছিলেন। এরপর সেখানে তার সেবা প্রদানকালীন সময়ে তাকে জামেয়াতে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। আর প্রায় দশ বছর তিনি শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করেছেন। অতঃপর ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে ওয়াকালতে তবশীরে নিয়োজিত করা হয়, নায়েব ওয়াকিলুত তবশীর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে জামেয়ায় থাকাকালে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়া ও অঙ্গসংগঠনসমূহেও সেবা প্রদান করেছেন; জামেয়ায় থাকাকালীন সময়েও এবং তার পাকিস্তানে মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে সেবা প্রদানকালেও।

১৯৮৬ সালে তাকে মুবাল্লেগ সিলসিলা হিসেবে আমেরিকায় প্রেরণ করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে এখানে ডেকে এনে গ্লাসগোতে পোস্টিং দেন; সেখানে তিনি মুরব্বী সিলসিলা ও মুবাল্লিগ সিলসিলা হিসেবে সেবা করার সুযোগ পান। ২০০৫ সালে জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের সূচনাতে তাকে জামেয়ার অধ্যক্ষ হিসেবেও নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি প্রায় ৫৯ বছর জামা'তের সেবা করেছেন।

লন্ডনের ফযল মসজিদের ইমাম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব বলেন, মরহুম ইসলাম ধর্মের প্রতি উৎসর্গিত ও খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক সেবক, জীবনোৎসর্গকারীর দায়িত্ব উত্তমরূপে পালনকারী একজন সফল মুবাল্লেগ সিলসিলা ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে ধর্মের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। অত্যন্ত সুললিত ও আবেগসঞ্চারী কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে তরবিয়তমূলক বিষয়াদিতে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। যেসব জামা'তে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন সেখানে অসংখ্য পুণ্যের স্মৃতি রেখে গেছেন। জামা'তের সদস্যদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং জনপ্রিয় একজন ধর্মসেবক ছিলেন। লেখালেখির ক্ষেত্রেও তিনি বিভিন্ন সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। দোয়ার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি তার ঘরের

দেয়ালগুলো বিভিন্ন দোয়ামূলক বাক্য দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছিলেন। অসংখ্য গুণাবলির অধিকারী ছিলেন।

মুবারক সিদ্দিকী সাহেব বলেন, আমি তাকে রাবওয়ার যুগ থেকেই চিনি। অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, হাস্যোজ্জ্বল, ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখতেন। তার সাথে সাক্ষাৎকারীদেরকে খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্য করার উপদেশ দিতেন। তিনি আরো বলেন, তার পকেটে সর্বদা একটি ছোটো নোটবুক থাকত; যেখানেই কোনো ভালো কথা শুনতেন বা দেখতেন– তৎক্ষণাৎ তা নোট করে নিতেন। বিশেষ কোনো ব্যক্তির কথা হতে হবে এমন নয়; বরং যেখানেই কোনো ভালো কথা শুনতেন, তা তৎক্ষণাৎ নোট করে নিতেন। ছাত্রজীবন থেকেই জামা'তের বুযুর্গদের সাহচর্যে বসা তার অভ্যাস ছিল। হাফেয মুখতার আহমদ শাহজাহানপুরী সাহেবের (রা.) অনেক কথা তার স্মরণ ছিল, নিজ পরিচিত মহলে মাঝে মাঝে সেগুলো শোনাতেনও।

তার কন্যা কুররাতুল আইন বলেন, আমার পিতার মাঝে আমি বিশেষভাবে যেসব বিষয় লক্ষ করেছি তার মাঝে অন্যতম ছিল তার দোয়া করার ধরন। তার দোয়ায় ব্যাকুলতা, বিনয়, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ও আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আবদারের সাথে যাচনা করার অদ্ভুত ধরন ছিল। কখনো মনে হতো, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো উত্তর না পাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করা থামাবেন না। আর তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আচরণও এমন অদ্ভুত ছিল যে, বিভিন্ন সময় সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে অনেক বিষয়ে পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে জানিয়ে দিতেন। তিনি বলেন, তিনি দোয়ার বিষয়ে আমাদেরকে নসীহত করতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দোয়াকারীর অবস্থা এমন হওয়া উচিত- 'জো মাঙ্গে সো মর রেহে, মরে সো মাঙ্গন জা'। এটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়; যাচনাকারীর অবস্থা মৃতবৎ হওয়া উচিত, আর যখন এমন অবস্থায় প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা শুনবেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন। আজ জুমুআর পর বাহিরে গিয়ে আমি তার হাযির জানাযা পড়াবো।

দ্বিতীয়টি গায়েবানা জানাযা; এই স্মৃতিচারণ মোকাররম সেগা জালু সাহেবের, যিনি মালির সিগো অঞ্চলের নায়েব আমীর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনিও মূসী ছিলেন। মুবাল্লেগ সিলসিলা তাসির সাহেব লেখেন, রেডিও প্রোগ্রাম শোনার মাধ্যমে মরহুম ২০১৬ সালে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি ঈমানের ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি করেছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় আহমদী ছিলেন। জামা'তী প্রোগ্রামসমূহে এবং আর্থিক কুরবানীতে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতেন। প্রতিদিন অনেক দূর থেকে মসজিদে এসে ফজর, মাগরিব এবং এশার নামায আদায় করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। ২০১৮ সালে তিনি ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন আর মৃত্যু অবধি প্রতি মাসের শুরুতেই নিজ বেতন থেকে ওসিয়্যতের চাঁদা আদায় করে দিতেন। একবার তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কোনো কারণে বেতন পান নি, আফ্রিকাতে মাঝে মাঝে এমনটি হয়। চাঁদা দিতে না পারায় তিনি অত্যন্ত অস্থির ছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং বেতন পাওয়ামাত্রই সর্বপ্রথম তিনি নিজ ওসিয়্যতের চাঁদাসহ বাকি সকল চাঁদা আদায় করে দেন। তার স্ত্রী এবং তিন ছেলে ছিলেন যাদেরকে তিনি তবলীগ করতেন, আর তার তবলীগেই দুই ছেলে আহমদী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী ও এক ছেলে আহমদীয়াত গ্রহণ করে নি। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। আহমদীয়াতের ওপর অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

অআহমদীদের এবং মোল্লাদের বিষয়ে তার ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল। তিনি বলতেন, এসব লোক মসীহ্ ও মাহদীকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত সফল হতে পারে না। অত্যন্ত সক্রিয় তবলীগকারী ছিলেন এবং জামা'তের সেবকও ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)